ইসলাম আমার অহংকার

বই	**ইসলাম আমার অহংকার**
লেখক	শাইখ মুহাম্মদ মুতাওয়াল্লি শারাবি রহ.
ভাষান্তর	মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন
সম্পাদনা	মুহিউদ্দীন কাসেমী
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন টিম
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	হাসেম আলী
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

ইসলাম আমার অহংকার

শাইখ মুহাম্মদ মুতাওয়াল্লি শারাবি রহ.

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

আব্দুর রহমান আদনান
মামা, ইনশাআল্লাহ একদিন তুমি বড়ো হবে
বিশ্বময় কুরআন-সুন্নাহর আলো ছড়িয়ে দেবে
সে প্রত্যাশায়...

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের এমন কোনো দিন নেই যেখানে ইসলামের নির্দেশনা নেই। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছি ইসলামের এই মহত্ত্ব নিয়ে? নিজেদের অজান্তেই কত না কতভাবে আমরা এর দ্বারা উপকৃত হচ্ছি? ঋদ্ধ হচ্ছি?

বস্তুর প্রকৃতি না জানলে তার সঠিক মূল্যায়ন করা যায় না। তার প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা তৈরি হয় না। সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। ইসলামের ক্ষেত্রেও। তাই মুসলিম হিসেবে আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃতি বুঝতে হবে। ইসলাম আমাদেরকে কী দিয়েছে তা জানতে হবে। বস্তুবাদের এ যুগে তো এর প্রয়োজনীয়তা অনেক অনেক বেশি। নিজেদের ঈমান সংরক্ষণের জন্যই তা করতে হবে। অন্যথায় যেকোনো মুহূর্তেই আমরা বস্তুবাদের ভয়াল থাবার শিকার হতে পারি। ঈমান-ইসলামের মতো মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে বসতে পারি।

'ইসলাম আমার অহংকার' শাইখ মুহাম্মাদ মুতাওয়াল্লি শারাবি রাহিমাহুল্লাহর এমনই একটি অনবদ্য গ্রন্থ। যা আপনার সামনে ইসলামের এসব মৌলিক বিষয়গুলো হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনায় তুলে ধরেছে।

বইটি অনুবাদ করেছেন, মেধাবি তরুণ আলিম মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন। ভাষা সম্পাদনা ও নিরীক্ষণ করেছেন শ্রদ্ধেয় মুফতি মহিউদ্দীন কাসেমী। আল্লাহ উভয়কেই উত্তম বিনিময় দান করুন।

বরাবরই আমরা প্রতিটি গ্রন্থ অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সাথে প্রকাশ করার চেষ্টা করি। এটিতেও একই প্রচেষ্টা রয়েছে। তারপরও যদি কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে আমাদেরকে জানানোর বিনীত অনুরোধ রইল। আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব।

আল্লাহ আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
১৪ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

অনুবাদকের কথা

ইসলামের সাথে বস্তুবাদের সংঘাত চিরন্তন। এ দুটি কখনো এক হতে পারে না। তাদের মাঝে এ বিরোধ লেগেই থাকবে। প্রতি যুগে। প্রতিক্ষণে। সময়ের পালাবদলে হয়তো মানুষের চেতনায় জোয়ার ভাটা আসবে কিন্তু মূল বিরোধ আপন জায়গায়, আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। দ্বন্দ্বটা যেহেতু চলমান এবং চিরন্তন, অপরিহার্যভাবে আমাদের মুসলিমদেরও তাতে জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে, উপরন্তু এতে কোনো পক্ষ বেছে নেওয়ার সুযোগ নেই; বরং সদা ইসলামের সাথেই আমাদের থাকতে হবে, তাই আমাদের জন্য আবশ্যিকভাবে চেতনার জায়গাকে পরিশুদ্ধ রাখা চাই। ইসলাম যে আমাকে উন্নত সভ্য ও মহান করেছে, সে বিশ্বাস ধারণ করা চাই। তাহলে নিজেকে সব সময় বিজয়ী মনে হবে। হীনম্মন্যতা তখন ধারেকাছেও ঘেঁষতে পারবে না। নিজেকে তখন একজন গর্বিত মুসলিম ভাবতে পারব। আর এজন্য চাই বেশি থেকে বেশি পরিমাণে ইসলামের সৌন্দর্য, তার যৌক্তিকতা এবং প্রাধান্যের ধারাগুলোর চর্চা। যে যত বেশি এর চর্চা করতে পারবে তার চেতনার জায়গা ততবেশি ধারালো এবং সমৃদ্ধ হবে। বিপরীত মতাদর্শ ও সংস্কৃতির প্রশ্নে তারমধ্যে তখন কোনো ধরনের হীনম্মন্যতা কাজ করবে না। বরং নিজেকে মুসলিম ভাবতে, মুসলিম বলে পরিচয় দিতেই তখন গর্ববোধ হবে।

আলহামদুলিল্লাহ শাইখ মুতাওয়াল্লি শারাবি রহ. তার অনবদ্য গ্রন্থ— *'হাযা দ্বীনু না'*য় এ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আকিদা-বিশ্বাস ও সংস্কৃতির প্রশ্নে ইসলাম কীভাবে অন্য সকল ধর্ম ও মতাদর্শের তুলনায় শ্রেষ্ঠ—এ গ্রন্থে তিনি সেটা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব ধারায়

অগ্রসর হয়েছেন। আলোচ্য বিষয়ে কুরআনের একটি আয়াত নিয়েছেন। এরপর সে আয়াত নির্ভর আলোচনা করে গেছেন। প্রয়োজনে তিনি বাস্তব পরিবেশেও এসেছেন। আপন অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। ফলে তার আলোচনায় যেমন কুরআনের মর্ম উপলব্ধির অনাবিল স্বাদ পাওয়া যায় তেমনই বাস্তবতার মাধ্যমে বিবেকের দ্বার উন্মুক্ত করার খোরাকও লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

আমরা এ গ্রন্থের পূর্ণ অনুবাদের পথে হাঁটিনি। বরং আমরা নির্বাচিত কিছু প্রবন্ধ অনুবাদ করেছি। আশা করি এগুলো আমাদের চেতনা সমৃদ্ধির মশাল হবে। আমাদের মধ্যে ইসলামের চেতনা জাগ্রত করবে। নিজেকে আমরা মুসলিম বলে পরিচয় দিতেই গর্ববোধ করব।

—মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন

কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

১২.১১.২০২০ ইং

সূচিপত্র

প্রতিপালক সত্তার দান	১৩
হালাল রিজিক এবং শয়তানের ধোঁকা	৫৩
তাকওয়া তথা খোদাভীতি	৮০
হকের বাণী	১০১
রাসুল সা. নুর ও বুরহান	১১৬
অবাধ্যতা এবং ভোগবিলাস	১২৭
ভীতিকর দিবস	১৩৬

প্রতিপালক সত্তার দান

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। স্রষ্টা ও প্রতিপালক হিসেবে তিনি আমাদেরকে বহু নিয়ামত দান করেছেন। কেউই তাঁর এ দান থেকে বঞ্চিত হয়নি। সূর্য এমনই একটি দান। মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলকেই আলো দান করে থাকে। যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে এবং যে ব্যক্তি বলেনি উভয়ের ওপরই বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে থাকে। যারা নামাজ আদায় করে এবং যারা জীবনে একটি বারের জন্যও এক রাকাত নামাজ আদায় করেনি সকলেই বাতাস থেকে শ্বাস-নিশ্বাস গ্রহণ করে থাকে। আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং অকৃতজ্ঞ—সকলেই তাঁর দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। সব নিয়ামতের ক্ষেত্রে চিন্তা করে দেখুন একই নিয়ম।

কেননা এগুলো স্রষ্টা ও প্রতিপালকের দান। তিনি সকল সৃষ্টজীবকে এসব নিয়ামত দান করে থাকেন। কিন্তু তার ইলাহ সত্তার দান শুধু মুমিনদের জন্য। মুমিনরা তা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই পেয়ে থাকে।

এসব দানের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টিজীবকে বোঝাতে চান যে, এগুলোই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং ইবাদাতের জন্য যথেষ্ট।

কুরআনুল কারিম এক মহান কিতাব। সামন পেছন—কোনো দিক থেকেই বাতিল যাকে স্পর্শ করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা এ কিতাবে মানুষকে সম্বোধন করেছেন। এর দ্বারা স্থান-কাল নির্বিশেষে কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হওয়া থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষই উদ্দেশ্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈমান আনার জন্য সম্বোধন করেছেন। ঈমান আনার অর্থ হলো অংশীদারবিহীন একক সত্তার সামনে মাথা নত করে দেওয়া। আল্লাহ তাআলার বিধি নিষেধগুলো মেনে চলা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ .

হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো—যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা পরহেজগারি অর্জন করতে পার। যে পবিত্র সত্তা তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ-স্বরূপ স্থাপন করেছেন, যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে খাদ্য-স্বরূপ তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেন। অতএব, আল্লাহর সাথে তোমরা অন্য কাউকে সমকক্ষ বানিয়ো না। বস্তুত এসব তোমরা জান। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২১-২২]

আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াতে ইবাদত এবং সৃষ্টির বিষয়টি একসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। অপর এক আয়াতে তিনি এ ব্যাপারে বলেন—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ .

আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি। [সুরা যারিয়াত, আয়াত : ৫৬]

এর দ্বারা বুঝা গেল, মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো ইবাদত। ইবাদতের জন্যেই মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাআলার কোনো কাজেই কারণ ও কার্যকরণের ভূমিকা নেই। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

কেননা আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত হলে আদতে আল্লাহ তাআলার কোনো ধরনের উপকার সাধন হয় না, তাঁর কোনো লাভ নেই। তিনি গোটা বিশ্ব থেকেই অমুখাপেক্ষী; বরং আল্লাহর নির্দেশ পালনে সৃষ্টিজগতেরই ফায়দা ও উপকার রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন সত্য; কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে নিজের ক্ষমতা ও রাজত্বের প্রবৃদ্ধি ঘটানো এবং সুসংহতকরণ তাঁর উদ্দেশ্য নয়। বরং ইবাদত করলে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরই কল্যাণ সাধিত হবে।

তাই আল্লাহ তাআলার কার্যাবলি ও বিধিনিষেধ সকল ধরনের কারণের ঊর্ধ্বে। তবে বান্দারা এ সকল বিধিনিষেধ পালনের মাধ্যমেই উপকৃত হয়ে থাকে।

ইবাদতের অর্থ হলো, আল্লাহর নির্দেশাবলি মান্য করা। তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা। তবে এই বিধিনিষেধ পালনে আল্লাহর পক্ষ হতে কোনো জোর ও শক্তি খাটানো হয় না; বরং মানুষ ইচ্ছা করলে এগুলো পালন করতে পারে আবার নাও করতে পারে। তাই আল্লাহ তাআলার বিধিনিষেধ পালনের প্রশ্নে অপরিহার্যভাবেই মানুষের মাঝে দুটি শ্রেণি পাওয়া যায় : আনুগত্যশীল ও অবাধ্য। কেউ আল্লাহর নির্দেশাবলির আনুগত্য করে আবার কেউ তা করে না।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জান্নাত জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেননি; বরং তাদেরকে তিনি পরীক্ষার জন্য সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে যে ঈমান আনবে এবং আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে তাঁর অবাধ্যতা করবে সে যাবে জাহান্নামে।

কিন্তু ইবাদতের অর্থ কী? ইবাদত কি মসজিদে তাসবিহ নিয়ে বসে থাকার নাম? নাকি এটি একটি জীবনব্যবস্থা? যা ঘরে-বাইরে কাজকর্ম সর্বক্ষেত্রেই বিভিন্ন বিধিবিধান আরোপ করে থাকে?

আল্লাহ তাআলা যদি বান্দাদের থেকে নামাজ এবং তাসবিহের ইচ্ছা রাখতেন তাহলে তাদেরকে যা খুশি করার ইচ্ছাধিকার দিয়ে সৃষ্টি করতেন না। বরং তিনি অন্যান্য সৃষ্টির মতোই তাদেরকে ইবাদত পালনে বাধ্য করে সৃষ্টি করতেন।

আল্লাহ তাআলা চাইলেই তা করতে পারতেন। তিনি তো কাহহার—দোর্দণ্ড প্রতাপ ও ক্ষমতার অধিকারী, যা খুশি করতে পারেন। কুরআনে এসেছে—

إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ .

> আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে তাদের ওপর কোনো নিদর্শন নাজিল করতে পারি, তখন তারা এর সামনে নত হয়ে যাবে। [সুরা শুআরা, আয়াত : ৪]

আল্লাহ তাআলা যদি বিধিবিধান মান্য করার জন্য আমাদের বাধ্য করতেন তাহলে কেউই তাঁর আনুগত্য থেকে বিরত থাকতে পারত না। আমাদের শরীরে এবং বিশ্বজগৎ প্রকৃতিতে তাকালেই আমরা তা বুঝতে পারব।

আমাদের দেহের বহু বিষয়ে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মানতে বাধ্য। আমাদের হৃদ আল্লাহ তাআলা নির্দেশেই নড়াচড়া করে এবং থেমে যায়। এতে আমাদের ইচ্ছার কোনো দখল নেই।

পরিপাকতন্ত্র খাবার হজম করে। আমরা তার সম্পর্কে কিছুই জানি না। আমাদের ইচ্ছার বাইরেই রক্ত সঞ্চালন করে থাকে। আমরা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।

এ ছাড়াও আমাদের দেহে বহু বিষয় রয়েছে, যা আল্লাহ তাআলার নির্দেশের অধীন। এর কার্য পরিচালনায় আমাদের ইচ্ছার কোনো দখল নেই। বিপদাপদও আমাদের ইচ্ছার বাইরে। আমরা চাইলেও বিপদ প্রতিহত করতে পারি না। আমরা না চাইলেও গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যায়। বিমান বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

এর দ্বারা বুঝা গেল আমাদের জীবনের ইচ্ছার পরিধি সীমিত। আমি কবে জন্ম নেব? আমার পিতা-মাতা কে হবে? আমার আকার-আকৃতি কেমন হবে। আমি লম্বা হব না খাটো? সুন্দর না কালো? প্রভৃতি বিষয় নির্বাচন ও পছন্দ করার ক্ষমতা আমাদের নেই।

এর দ্বারা বুঝা গেল, আমাদের ইচ্ছার পরিধি আল্লাহ তাআলা বিধিনিষেধ পালন পর্যন্ত সীমিত। আমরা চাইলে তাঁর বিধিনিষেধ পালন করতে পারি কিংবা পালন নাও করতে পারি।

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলা অন্য সকল সৃষ্টিজীবকে ইবাদতে বাধ্য করে থাকেন। তবে সেই ইবাদতের প্রকৃতি ভিন্ন; তিনি কেবল মানুষ ও জিন জাতিকেই ইবাদত করা বা না করার ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছেন। তারা আল্লাহর ভালোবাসার টানে ইবাদত করতেও পারে আবার নাও করতে পারে। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এখন আমাদের ইচ্ছাধিকার রয়েছে। চাইলে তাঁর বিধিনিষেধ পালন করতেও পারি আবার নাও করতে পারি... তাঁর আনুগত্যও করতে পারি, অবাধ্যতাও করতে পারি... তাঁর প্রতি ঈমান আনতেও পারি নাও পারি...।

আপনি আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসলে বাধ্য হয়ে নয় বরং নিজের ইচ্ছাতেই তাঁর আনুগত্য করবেন। তাঁর ভালোবাসা থেকেই তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকবেন। ভালোবাসার কারণে তাঁর আবেদন পূরণ করবেন।

যদি স্বেচ্ছায় আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা পূরণ করে আপনি ইবাদত করেন, তাহলে সেটা হবে ভালোবাসাময় ইবাদত। সে সময় আপনি আল্লাহ তাআলার একজন বান্দা হয়ে যাবেন। তার গোলাম নয়। গোলামরা বাধ্য হয়ে কাজ করে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বান্দা হচ্ছে, যারা স্বেচ্ছায় তাঁর বিধিবিধান পালন করে থাকে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বান্দা এবং গোলামের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ .

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করি—যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নি:সংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে চলতে পারে। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৮৬]

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন—

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۞ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا .يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا . وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا .

রহমান—দয়াময়ের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা কথা বলতে থাকে তখন তারা বলে, সালাম। এবং যারা রাত্রি যাপন করে পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সিজদাবনত ও দণ্ডায়মান হয়ে। যারা বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত বিনাশ; বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা। তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না। তারা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে। যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না। আল্লাহ যা হত্যা অবৈধ করেছেন, সংগত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করে না। ব্যভিচার করে না। যারা একাজ করে, তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে।

কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। কিন্তু যারা তওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আর যে তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে বস্তুত তাওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন ভদ্রভাবে চলে যায়। যাদেরকে তাদের পালনকর্তার আয়াতসমূহ বোঝানো হলে তাতে অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য চোখের শীতলতা প্রদানকারী বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকিদের নেতা হওয়ার তাওফিক দান করো। [সুরা ফুরকান, আয়াত : ৬৩-৭৪]

এখানে আমরা দেখতে পেলাম আল্লাহ তাআলা মুমিনদের গুণাবলি উল্লেখ করে তাদেরকে বান্দা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু যখন তিনি অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তখন তাদেরকে গোলাম বলে আখ্যা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ .

এটা তোমাদের কৃতকর্মের ফল। বস্তুত আল্লাহ গোলামদের প্রতি অত্যাচার করেন না। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৮২]

কেউ নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আপত্তি তুলতে পারে যে, এতে অবাধ্য ও পথভ্রষ্ট লোকদের আলোচনা করা হয়েছে; তবুও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বান্দা বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَٰؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ .

সেদিন আল্লাহ তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করত তাদেরকে একত্রিত করবেন। তিনি তাদেরকে বলবেন, তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রান্ত করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রান্ত হয়েছিল? [সূরা ফুরকান, আয়াত : ১৭]

এর উত্তর হলো আয়াতে পরকালের কথা বলা হয়েছে। পরকালে সকলেই আল্লাহর বান্দা হয়ে যাবে। কেননা, তখন আমরা সকলেই একক উপাস্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে বাধ্য। কেননা, মৃত্যু হওয়া মাত্রই মানুষের ইচ্ছাধিকার শেষ হয়ে যায়। তখন থেকে সকলেই আল্লাহর বান্দা হয়ে যায়। কারও কোনো ইচ্ছাধিকার থাকে না। বাধ্য হয়ে তারা আল্লাহর আনুগত্য করে।

আল্লাহ তাআলা পার্থিব জগতে বান্দাকে ইবাদতের ইচ্ছাধিকার প্রদান করেছেন। কোনো বিষয়ে তাকে বাধ্য করেননি। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি তাদের ওপর কোনো আজাব ও শাস্তি আরোপ করেননি।

বরং মুমিনরা স্বেচ্ছায় নিজেদের ওপর আল্লাহপ্রদত্ত বিধিবিধান এবং তাঁর প্রণীত জীবনব্যবস্থা আবশ্যক করে নিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ঈমানি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এ কারণে আমরা দেখতে পাই বিধিবিধানের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সকল মানুষকে সম্বোধন করেন না; বরং তিনি কেবল মুমিনদেরকেই সম্বোধন করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর, যেন তোমরা পরহেজগারি অর্জন করতে পার। [সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৩]

অপর এক আয়াতে তিনি বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ .

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। [সুরা বাকারা, আয়াত : ১৫৩]

এসকল আয়াতে দেখতে পাচ্ছি, যারা ঈমান আনার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় তিনি তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করছেন।

আমাদেরকে একটি বিষয় ভালোভাবে বুঝতে হবে যে, শুধু দ্বীনের রুকনসমূহ তথা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবি হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান, নামাজ কায়েম, জাকাত প্রদান, রোজা রাখা, সক্ষমতা থাকলে হজ আদায় প্রভৃতি বিষয়গুলোর নাম ইবাদত নয়; বরং এগুলো হলো ইসলামের রুকন। এগুলো পালন করা অত্যাবশ্যক। এগুলো মানুষের ঈমানি শক্তিকে মজবুত করে। মুমিনগণ এর মাধ্যমে পৃথিবীকে নিজেদের মতো করে আবাদ করতে পারে।

আর ইবাদত হলো যা মানুষের জীবনকে সফল করে। জগৎ নির্মাণের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করে। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ স্রষ্টা ও স্রষ্টার নিদর্শন থেকে ঈমানি শক্তি লাভ করে থাকে। এর মাধ্যমে তারা বিশ্বজগৎ নির্মাণ করতে পারে।

মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহ তাআলার খলিফা। তাই যেসকল কাজ এই খিলাফতের দায়িত্বের উপযোগী সবগুলোই ইসলাম। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমে বলেন—

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ .

আর সামুদ জাতির প্রতি তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করি। তিনি বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই। তিনিই জমিন হতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনে তোমাদের আবাদকারী বানিয়েছেন। অতএব, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। তাঁরই দিকে ফিরে এসো। আমার পালনকর্তা নিকটেই আছেন। তিনি আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন। [সুরা হুদ, আয়াত: ৬১]

এর মাধ্যমে বুঝা গেল, পৃথিবী আবাদ সংক্রান্ত জীবনের সকল কর্মকাণ্ডই ইবাদত। অতএব, শুধু নামাজ-রোজাকে ইবাদত ভেবে বসে থাকা যাবে না। কেননা, নামাজ-রোজা প্রভৃতি হলো রুকন তথা ইসলামের ভিত্তি। যার ওপর আমাদের জীবন পরিচালিত হয়ে থাকে। যদি শুধু এসব রুকনকে একমাত্র ইসলাম বলা হয় তাহলে ইসলামকে বিল্ডিংবিহীন ফাউন্ডেশন আখ্যা দেওয়া হবে। কেননা, উল্লিখিত বিষয়গুলো ইসলাম নামক বিল্ডিংয়ের রুকন তথা ফাউন্ডেশনের ন্যায়।

অতএব, যেসব কাজ আল্লাহপ্রদত্ত খেলাফতের উপযোগী তার প্রত্যেকটি হলো ইসলাম। পৃথিবীতে মানুষ খলিফা হওয়ার অর্থই হলো তারা পৃথিবীকে আবাদ করবে। আর আবাদ করার অর্থই হলো তাতে বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালনা করা।

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম, বিশ্বজগৎ নির্মাণ এবং তার উৎকর্ষের ক্ষেত্রে যা কিছু করা হবে সবই ইবাদত।

কেউ বলতে পারেন, আমরা সব সময় ইবাদত-বন্দেগি করব। কিন্তু কোনো কাজ করব না। তাদের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, প্রতিদিন নির্ধারিত নামাজ আদায় করতে কতটুকু সময় লাগে? ধরে নিলাম এক ঘণ্টা। বছরে জাকাত আদায় করতে কত দিন লাগে? মাত্র একদিন। রোজা পালন করতে কী পরিমাণ সময় লাগে? বছরে মাত্র এক মাস। আর হজ তো জীবনে মাত্র একবার! এর চেয়ে বেশি কিছু?

আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি, তাহলে আপনি জীবনের অবশিষ্ট এত বিশাল সময় কী করবেন?

আপনার তো নামাজ আদায় করতে দিনে এক ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না! বছরে জাকাত আদায় করতে একদিনের বেশি সময় লাগে না! সারা বছরে মাত্র একটি মাসই তো রোজা রাখেন! জীবনে মাত্র একবার হজ করতে হয়! তাও সামর্থ্য থাকলে! তাহলে অবশিষ্ট সময় কী করেন? খাওয়াদাওয়া করেন। পোশাকআশাক পরেন। রুটিরুজি তালাশ করেন।

প্রশ্ন হলো, কে আপনার জন্য এগুলোর ব্যবস্থা করে দেবেন?

মনে রাখবেন, এক টুকরো রুটি বা এক মুঠো ভাত আপনার মুখে আসতে বহু স্তর পাড়ি দিতে হয়। বহু মানুষকে এর পেছনে চেষ্টাপ্রচেষ্টা করতে হয়। শ্রম ব্যয় করতে হয়।

একটু লক্ষ করে দেখুন, রুটির টুকরোটি আপনার মুখে পৌঁছতে কত শ্রম ব্যয় হয়েছে?! কত মানুষ এর পেছনে পরিশ্রম করেছে?!

আপনি বসে বসে নামাজ-রোজা আদায় করবেন আর এত সকল মানুষ আপনার জন্য খেটে যাবে?! এটা কীভাবে হতে পারে??

না, কোনো চেষ্টা-পরিশ্রম ব্যতীত অন্যের ফসল গ্রহণ করা আপনার জন্য উচিত হবে না।

আরেকটি উদাহরণ লক্ষ করুন, আপনি যে কাপড় পরিধান করছেন এর পেছনে কত মানুষের কষ্ট রয়েছে? কত মানুষের চেষ্টা-পরিশ্রম জড়িত রয়েছে? কেউ সুতা কেটেছে। কেউ কাপড় বয়ন করেছে। কেউ সেলাই করেছে। কতজনের ভায়া হয়ে আপনার গায়ে জামা উঠেছে!

তাই নির্লিপ্ত বসে থাকবেন না। অন্যের মাধ্যমে শুধু শুধু উপকৃত হবেন না। এটা বলবেন না যে, আমাকে শুধু ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আরে ভাই! এটাই তো একমাত্র ইবাদত নয়। ইবাদত হলো আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুসরণ করা। তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা। সুরা হুদে এ বিষয়টি বলা হয়েছে—

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا.

> তিনিই তোমাদেরকে জমিন থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং জমিনে আবাদকারী বানিয়েছেন। [সুরা হুদ, আয়াত : ৬১]

আপনার সকল কাজ ও চেষ্টাপ্রচেষ্টাই ইবাদত। কেননা, তার মাধ্যমে পৃথিবী আবাদ হয়। যদি কোনো কাজকর্ম না করেন তাহলে আপনি অলস হয়ে যাবেন। প্রকৃত ঈমানের দাবি হলো, আপনি নিজের কাজের মাধ্যমে নিজে উপকৃত হবেন। অন্যের কাজের ওপর নির্ভর করে বসে থাকবেন না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পৃথিবীতে তার খলিফা বানিয়েছেন। যাতে আমরা এই পৃথিবী আবাদ করি। আর সকল কাজকর্ম ভালোভাবে আঞ্জাম দেওয়াটা ইবাদতের সৌন্দর্য। অতএব, আমরা শুধু ইসলামের রুকনগুলো পালন করব না বরং আমরা রুকন পালন তথা ফাউন্ডেশন গড়ার পাশাপাশি বিল্ডিং নির্মাণ করব। তাহলে আমরা ঈমানের দায়িত্ব ও চাহিদা পূরণ করতে পারব। তখন আমাদের সকল কাজকর্ম আমাদের লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ—এই বক্তব্যের অনুকূল ও চাহিদানুযায়ী হয়ে যাবে।

কুরআনে এসেছে—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। [সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৫]

ইবাদতকে একমাত্র তাঁর জন্যই বিশেষায়িত করা হয়েছে। আয়াতে যদি বলা হতো نعبدك وحدك (আমরা আপনার একক সত্তার ইবাদত করি) তাহলে পূর্বের অর্থ পাওয়া যেত না। কেননা, সে ক্ষেত্রে এমনটি বলার অবকাশ থেকে যায় نعبدك وحدك ومعك كذا وكذا (আমরা আপনার একক সত্তার ইবাদত করি এবং আপনার সাথে অমুক অমুক সত্তার ইবাদত করি) কিন্তু যখন আপনি বলবেন—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি।

তখন আপনি একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই ইবাদতকে নির্দিষ্ট করে দিলেন। অন্য সকলের ইবাদতের দরজা বন্ধ করে দিলেন। এ ক্ষেত্রে অন্য কাউকে আর যুক্ত করার সুযোগ থাকে না।

তাই ইবাদত হলো আল্লাহ তাআলার সকল বিধিনিষেধের সামনে মাথা নত করে দেওয়া। এই কারণে আল্লাহ তাআলা নামাজকে সকল ইবাদতের ভিত্তি বানিয়েছেন। আর সিজদা হলো আল্লাহর প্রতি বিনীত হওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। কেননা, এর মাধ্যমে শরীরের সবচেয়ে সম্মানিত অঙ্গকে পা রাখার স্থান জমিনে রাখা হয়। তাই এতে আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনয়াবনত হওয়ার সর্বোচ্চ স্তর নামাজে সকলের সামনে সিজদা দেওয়ার মাধ্যমে এটি পূর্ণতায় পৌঁছে।

ইবাদতের ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, ছোটো বড়ো সকলেই সমান। সকল মানুষের সামনে সিজদা দেওয়ার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের অন্তর থেকে অহংকার ঝেড়ে ফেলি। এভাবে আল্লাহর প্রতি বিনয় প্রকাশের দিক থেকে সকলেই সমান হয়ে যাই।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِيَّاكَ نَعْبُدُ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। [সূরা ফাতিহা, আয়াত : ৫]

এর মাধ্যমে আমরা ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ব্যতীত কারও জন্য আমরা ইবাদত করি না।

তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাকে ছাড়া আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়।

আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন—

الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ .

আলিফ-লা-ম-রা। এই কিতাব প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। এর আয়াতসমূহ সুস্পষ্ট, সুবিন্যস্ত ও পরে বিশদভাবে বিবৃত যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদত করবে না। নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি তাঁর পক্ষ হতে সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতা। [সূরা হুদ, আয়াত: ১-২]

কুরআনের আয়াতসমূহ দ্ব্যর্থহীন করা হয়েছে এবং এগুলোকে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই, সেটা হলো যেন আমরা আল্লাহ ভিন্ন আর কারও ইবাদত না করি।

ইবাদতের অর্থ হলো বান্দার জন্য তার মাবুদের সকল আদেশ-নিষেধের আনুগত্য করে যাওয়া।

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম, ইবাদতের অর্থ হলো একজন মাবুদ থাকতে হবে। যিনি আদেশ করবেন, নিষেধ করবেন। যে মাবুদ কোনো আদেশ-নিষেধ করে না সে ইবাদাতের যোগ্য হতে পারে না।

লক্ষ করে দেখুন, মূর্তিপূজক কি মূর্তি থেকে কোনো আদেশ-নিষেধ পেয়ে থাকে? যে ব্যক্তি সূর্যের পূজা করে থাকে সূর্য কি তাকে কোনো আদেশ নিষেধ করে থাকে?

অতএব, আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও ক্ষেত্রে ইবাদত শব্দ প্রয়োগ করাটা সম্পূর্ণ বাতিল। কেননা, মূর্তি ও সূর্য কোনো আদেশ-নিষেধ কিছুই করতে পারে না। উপরন্তু তাদের উপাসকরা সেই অনুযায়ী আমল করলে কিংবা তা অমান্য করলেও তারা কোনো প্রতিদান বা শাস্তি দিতে পারে না।

আদেশ-নিষেধ ব্যতীত কখনো ইবাদত অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। তেমনইভাবে যে ইবাদতের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান বা শাস্তি নেই সেটিও কোনো ইবাদত নয়।

এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর প্রতি গভীর নজর দিতে হবে,

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ

যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কার ইবাদত করো না। [সূরা হুদ, আয়াত: ২]

নবি-রাসুলগণ মানুষের নিকট এসে যদি কোনো শক্তির প্রতি বিনীত না হতে বলতেন, কারও ইবাদত ও গুণকীর্তন করার কথা না বলতেন, তাহলে তারা শুধু এতটুকুই বলে ক্ষান্ত হয়ে যেতেন যে, اعبدوا الله। তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। কিন্তু তারা এমনটি করেননি। কুরআনে এসেছে যে, সকল নবি-রাসুল মানুষদেরকে বলেছেন—

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ .

যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। [সুরা হুদ, আয়াত: ২]

এই আয়াতের মাধ্যমে বুঝে আসে যে, সেসকল সম্প্রদায় আল্লাহ তাআলা ব্যতীত বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করত। এ কারণে নবিগণ প্রথমে তাদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন। এরপর আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে নিষেধ ও নির্দেশ উভয়টি রয়েছে। যেমন কালিমা তাইয়্যেবার ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে, اشهد ان لا اله الا الله আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। উক্ত কালিমার মাধ্যমে আমরা প্রথমে আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল উপাস্যের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে থাকি। এরপর একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যই উলুহিয়াত সাব্যস্ত করি।

এ সাক্ষ্য প্রদানের অর্থই হচ্ছে, কোনো এক সম্প্রদায় নিশ্চয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইলাহ সাব্যস্ত করে থাকে। যদি তারা একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে ইলাহ সাব্যস্ত করত, তাহলে আমাদেরকে উক্ত সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন হতো না।

লক্ষ করে দেখুন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ .

যেন তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। [সুরা হুদ, আয়াত: ২]

এর অর্থ হলো প্রথমে বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করা হবে। আর বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করা হলে অপরিহার্যভাবেই হক সাব্যস্ত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে প্রতিটি বিষয় সঠিক রূপ লাভ করে। তাই প্রথমে আপনাকে যাবতীয় মূর্তি এবং শরিক থেকে ইবাদতকে মুক্ত করতে হবে। এরপর একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদতে নিমগ্ন হতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সকল বিধি-নিষেধ মান্য করাটাই হলো ইবাদত। তাঁর বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর নির্দেশনা রয়েছে। শাহাদাত

প্রদান তথা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু থেকে নিয়ে রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে তার বিধি-নিষেধ রয়েছে।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঈমানের সত্তরের অধিক কিংবা ষাটের অধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আর সর্বনিম্ন হলো রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা এবং লজ্জা ঈমানের অঙ্গ।[১]

তেমনইভাবে কোনো উত্তম কাজের উৎকৃষ্টতা বৃদ্ধির জন্য কিংবা কোনো সৎকাজের সততা বৃদ্ধির জন্য যে প্রচেষ্টা করা হয় সেটাও ইবাদত।

তাই ইবাদত শব্দটি জীবনের প্রতিটি কাজকর্ম ও বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কেননা আমাদের জীবনের বিষয়াদি হয়তো করণীয় পর্যায়ের হবে কিংবা বর্জনীয় পর্যায়ের। আর সেগুলো করণীয়-বর্জনীয় কিছুই না হলে তাতে করা বা না করার ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছাধিকার থাকবে।

আল্লাহপ্রদত্ত বিধি-নিষেধের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, এগুলো আমাদের জীবনের ব্যস্ততার পাঁচ শতাংশও নয়। কিন্তু সেগুলোই আমাদের জীবনের ভিত্তিমূল। জীবনের সকল কর্মকাণ্ড তার ভিত্তিতেই পরিচালিত হয়ে থাকে।

এর দ্বারা বোঝা গেল, নির্দেশ একমাত্র একক সত্তার। নিষেধ একক সত্তার। ইবাদত ও সিজদা একক সত্তার। এতে কারও কোনো অংশীদারি নেই। এ কারণে যুগে যুগে সকল সম্প্রদায়ের অহংকারী ও অবাধ্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইসলামের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা একে এক আশ্চর্যকর বিষয় আখ্যা দিয়েছে। তারা বলেছে—

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

> সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য সাব্যস্ত করেছে?! নিশ্চয় এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। [সুরা স-দ, আয়াত : ৫]

আমরা জানি আশ্চর্য হওয়ার অর্থ হলো বিস্ময় প্রকাশ করা। মানুষ যখন অপ্রত্যাশিত কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হয়ে থাকে তখন সে এই বিস্ময় প্রকাশ করে থাকে।

যেহেতু তারা নবিগণের এই দাওয়াতের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেছে তাই এর মাধ্যমে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই দাওয়াত তাদের নিকট প্রত্যাশিত ছিল না। যদি দাওয়াত প্রত্যাশিত হতো তাহলে তারা আশ্চর্যান্বিত হতো না।

---

[১] *সহিহ মুসলিম*, হাদিস : ৩৫।

কিন্তু মানুষ কেন আশ্চার্যান্বিত হবে?

বরং মানুষের তো এই সুন্দর ও চমৎকার বিশ্বজগৎ দেখে আশ্চর্যান্বিত হওয়া উচিত ছিল। তাদের জন্য এই বিশ্বজগতের স্রষ্টার পরিচয় জানা প্রয়োজন ছিল। রাসুলগণ তো তাদেরকে এ বিশ্বজগৎ সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। তারা বলেছেন—হে মানবজাতি, এ বিশ্বজগতের সকল উদ্ভিদ ও প্রাণিকুল তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। তোমরা নিজেদের শক্তি বলে এ বিশ্বজগৎ তৈরি করোনি। এ জগতের উদ্ভিদ ও প্রাণী তোমরা সৃষ্টি করোনি; বরং তোমরা এই বিশ্বজগৎ এবং সকল প্রজাতিকে সৃষ্ট হিসেবে পেয়েছ। তখন কি তোমাদের অন্তরে প্রশ্ন জাগেনি কে এগুলোকে তোমার জন্য সৃষ্টি করল? তখন অনিবার্যভাবেই ঈমানের বিষয়টি সামনে চলে আসবে।

তাই ঈমানের আলোচনাটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিবেকের কাজ হওয়া উচিত। অর্থাৎ বিবেকের মাধ্যমে যখন আমরা বিশ্বজগতের স্রষ্টার পরিচয় জানতে চাইব তখনই ঈমানের প্রশ্ন চলে আসবে।

তাহলে কি হে মানবজাতি তোমরা এমন এক বিষয় সম্পর্কে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছ, তোমাদের স্বভাব যা সম্পর্কে আলোচনা করতে বলে থাকে? তোমাদের বিবেকবুদ্ধি যার প্রতি ঈমান আনতে বলে থাকে? তিনি তো এমন এক সত্তা—যিনি আমাদের ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে উপকৃত হন না। এর মাধ্যমে তার কোনো ফায়দা পৌঁছায় না বরং এর মাধ্যমে আমরা উপকৃত হয়ে থাকি।

আল্লাহ তাআলা সকল ধরনের ফায়দা এবং উপকারিতা থেকে পবিত্র। কেননা যদি তোমরা তাঁর ইবাদত করো তাহলে এতে তাঁর রাজত্ব ও ক্ষমতায় সামান্য বৃদ্ধি ঘটবে না। আর যদি তোমরা তাঁর ইবাদত না করো তাহলেও তাঁর ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হ্রাস করতে পারবে না।

বরং আল্লাহর ইবাদত করলে তোমরাই উপকৃত হবে। কেননা তোমরা এর মাধ্যমে একটি জীবনব্যবস্থা লাভ করবে। এতে তোমাদের বহুমুখী প্রবৃত্তির অবসান ঘটবে। তোমাদের সকলের প্রবৃত্তি এক ধরনের হয়ে যাবে। তখন কারও সঙ্গে কারও বিরোধ ঘটবে না; বরং একে অপরের সহযোগী হবে। এভাবেই পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে তোমাদের জগৎ পূর্ণতা লাভ করবে।

অতএব, ইবাদত সকল সৃষ্টিকে একই উদ্দেশ্যের অধীনে নিয়ে আসবে। সকলেই আল্লাহর সামনে নত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তারা কোনো সংকোচ বোধ করবে না। কেননা তাদেরকে কোনো মানুষের সামনে নত হতে হচ্ছে না। বরং সৃষ্টিকর্তার সামনেই নত হতে হচ্ছে। উপরন্তু এর মাধ্যমে তাদের জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হবে।

তাই সকলকে এখন আল্লাহর ইবাদত করতে হবে। এ সকল শরিক উপাস্যদের ইবাদত করা যাবে না—যারা তাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তাদের আহ্বানে সাড়া দেয় না।

বরং কখনো কখনো তো প্রবল বাতাস এসে এসব মূর্তিকে ফেলে দেয়। মূর্তির ঘাড় ভেঙে যায়। তখন তারা এই মূর্তির নতুন মাথা সংযোজনের জন্য কামারের কাছে যায়। তাহলে এই ধরনের মূর্তি— যে নিজেরই উপকারের ক্ষমতা রাখে না, কীভাবে তার ইবাদত করা যেতে পারে? এই কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا .

> আপনি বলে দিন, আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন বস্তুকে ডাকব—যে আমাদের উপকার করতে পারে না এবং ক্ষতিও করতে পারে না। [সূরা আনআম, আয়াত : ৭১]

এই সকল মূর্তি তার উপাসকদের কী উপকার সাধন করেছে? আর যারা তার উপাসনা করে না সে তাদের কী ক্ষতি করছে?!

আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা বাতিল হওয়ার এটাই হলো প্রথম দিক। উদাহরণত, যে ব্যক্তি সূর্য পূজা করে, সূর্য তার কী উপকার সাধন করেছে? আর যারা সূর্যকে ইলাহ হিসেবে মানে না সূর্য তাকে কী শাস্তি দিয়েছে? যারা সূর্যের পূজা করে এবং যারা পূজা করে না সূর্য সকলকেই আলো বিলায়।

বরং যারা এইসব মূর্তি এবং সূর্যের পূজা করে না, তারাই উল্টো উপকৃত হয়েছে। কেননা, তারা নিজেদের চিন্তা-চেতনা বিবেক-বুদ্ধিকে বিশ্বজগতের স্রষ্টার পরিচয় জানার পেছনে ব্যয় করেছে।

এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারলাম, উপকার ও ক্ষতি একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই হতে পারে।

এ কারণেই যুক্তি এবং বিবেক আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারও উপাসনা করাকে অস্বীকার করে থাকে। কেননা, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই তাঁর সমর্থনকারীদের উপকার সাধন করতে পারে না বা তার বিরোধীদের কোনো ক্ষতি করতেও অক্ষম।

এই কারণে আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً ۖ إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ .

স্মরণ করো যখন ইবরাহিম তার পিতা আযরকে বললেন, আপনি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে করেন? আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি ও আপনার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট। [সুরা আনআম, আয়াত : ৭৪]

পথভ্রষ্টতা হলো আপনি কোনো লক্ষ্যে পৌঁছার ইচ্ছা করেও পৌঁছতে পারলেন না। রাস্তা হারিয়ে ফেললেন। এটাই হলো পথভ্রষ্টতা। আগেকার যুগে মানুষ সেই সত্তাকে সম্মান করতে চাইত, যিনি তাদের ওপর বিভিন্ন নিয়ামতরাজি প্রদান করেছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারা সে সত্তার নিকট পৌঁছার রাস্তা ভুল করে উপকরণ নিয়ে পড়ে থাকত। তারা সেই উপকরণের পেছনের শক্তির পর্যন্ত পৌঁছাতে পারত না। এভাবেই তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে যেত।

মানুষের স্বভাব হলো, যারা তার ওপর অনুগ্রহ করে থাকে সে তার প্রতি বন্ধুত্ব এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় হচ্ছে, পূর্ববর্তী পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় নিয়ামত লাভের উপকরণ বৃত্তেই আটকে পড়ে। উপকরণের স্রষ্টা পর্যন্ত তারা পৌঁছতে পারেনি।

এটি এক সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি। কেননা, এর ফলে এক সৃষ্টি অপর সৃষ্টির মাধ্যমে চেতনায় নিপতিত হয়। মানুষ পৃথিবীতে পা রেখেই ভূপৃষ্ঠ দেখতে পায়। সূর্য দেখতে পায়। চাঁদ দেখতে পায়। বিভিন্ন নক্ষত্ররাজি তাদের দৃষ্টিগোচর হয়। তারা দেখতে পায়, মেঘ তাদের বৃষ্টি বর্ষণ করছে। পাহাড়গুলো কিলকের ন্যায় তাদের অবস্থানস্থলকে স্থির রাখছে।

যেহেতু কোনো মানুষ এগুলো সৃষ্টি করেনি আর কেউ তা সৃষ্টি করার দাবিও করেনি তাই তাদের জন্য এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক ছিল যে, এগুলো কে সৃষ্টি করলেন?

আল্লাহ তাআলা যেহেতু সকল জিনিসের স্রষ্টা, তাই অবশ্যই তিনি ইবাদতের অধিক উপযুক্ত। কেননা, আমরা পূর্বেও বলেছি ইবাদত অর্থই হলো বিধিনিষেধ মেনে চলা।

আল্লাহ তাআলা যেহেতু এসব সৃষ্টি করেছেন, তাই তিনি আমাদের জন্য বিশ্বজগৎ সংরক্ষণের নীতিমালাও তৈরি করে দিয়েছেন। যদি কেউ এইসব নীতিমালা ভঙ্গ করে তাহলে বিশ্বজগৎ ও মানুষ উভয়েই ক্ষতির সম্মুখীন হবে। যদি মানুষ কিংবা বিশ্ব ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তাহলে আপনাকে এগুলোর স্রষ্টার নিকট আশ্রয় নিতে হবে। তাহলেই

কেবল সেই ক্ষতি পূরণ হতে পারে। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা ইবাদতের অধিক উপযুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ .

তারা কি এমন কাউকে শরিক সাব্যস্ত করে, যে একটি বস্তুও সৃষ্টি করেনি, বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [সুরা আরাফ, আয়াত : ১৯১]

যারা কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট, তাদেরকে কীভাবে আল্লাহর সঙ্গে ইবাদতের ক্ষেত্রে শরিক করা যেতে পারে? মূর্তিকে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ধারণাবশতই তারা এমনটি করেছে। এর সপক্ষে তাদের কোনো দলিলপ্রমাণ নেই। তাদেরকে বুদ্ধিমানের পরিচয় দেওয়া উচিত। মূর্তিকে উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করা অনুচিত।

নিম্নোক্ত আয়াতে তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ .

হে লোক সকল, একটি উপমা বর্ণনা করা হলো, অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শোনো। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজা করো, তারা কখনও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না; যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয়, তখন তারা তার থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও প্রার্থিত করা হয়, উভয়েই শক্তিহীন। [সুরা হজ, আয়াত: ৭৩]

অণু হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র জিনিস; যা খালি চোখে দেখা যায় না। গোটা বিশ্বজগতের মানুষ চাইলেও এ অণু পরিমাণ জিনিস সৃষ্টি করতে পারবে না।

এই কারণে আল্লাহ তাআলা বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করেছেন। তিনি বলেছেন, শুধু সৃষ্টির প্রশ্নই নয়; বরং কোনো মাছি যদি কোনো উপাস্যের খাবারে পড়ে ডানা দিয়ে